আজ ■ খ্রি.পূর্ব ৩২৩ প্রয়াত হন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেসান্দ্রো হো মেগাস। ইতিহাস তাঁকে 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' নামে মনে রেখেছে। তিনি ছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের অন্যতম প্রিয় ছাত্র। ৩২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন আলেকজান্ডার। তৎকালীন ভারতীয় ভূখণ্ডে কাটান প্রায় ১৯ মাস। তাঁর ভারত আক্রমণের সময়কালেই গ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে উপমহাদেশ।

রবিবার ১০ জুন ২০১৮

এমন একটা গল্প দরকার, যা রাত জাগাবে

সা ক্ষা ৎ কা র

মনোলিঙ্গুয়াল ভাষা সংস্কৃতির প্রতিনিধি তিনি নন। বাংলা ও ইংরেজি দু'টি ভাষাতেই সমান স্বচ্ছন্দ। সমান আগ্রহে দু'টি ভাষাতেই লেখেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বাংলা উপন্যাস 'তেজস্বিনী ও শবনম'। লেখা, উপকরণ জোগাড়, রিসার্চ ওয়ার্ক ও লেখার দর্শন নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার কুণাল বসু-র। কথা বললেন ভাস্কর লেট। সহায়তা সুপ্রিয় মিত্র। আজ প্রথম পর্ব

বাংলা এবং ইংরেজি, একই সঙ্গে দু'টি ভাষার চর্চা এবং দু'টি ভাষায় লেখার প্রবণতা বাঙালির মধ্যে ইদানীং ভীষণভাবে কমে আসছে। এর কী কারণ?

কুণাল বসু দেখুন, আমি যে প্রজন্মের বাঙালি, সেই প্রজন্মে বিশেষত সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ইংরেজি-বাংলার মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। যেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ছি, তেমনভাবেই চার্লস ডিকেন্সও পড়েছি। বিশ্বসাহিত্য ইংরেজি অনুবাদেই পড়েছি। তলস্তয়, টমাস মান। এঁদের সকলকেই খুব কাছের মানুষ মনে হত। ফলে বাংলা বা ইংরেজি— কোনও একটাকে পৃথকভাবে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। মিশনারি স্কুল নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির স্কুলেই আমার পড়াশোনা। সেখানে আমাদের সম্মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুই ভাষার প্রতিই সমান ভালবাসা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি সেই পরম্পরাটুকু বয়ে চলেছি, এই মাত্র।

এখন, খুব গূঢ় কিছু সমাজতাত্ত্বিক কারণে, দ্বিভাষিক সংস্কৃতি ক্রমশ 'মনোলিঙ্গুয়াল' বা একভাষিক সংস্কৃতির দিকে ঢলে পড়েছে। এর প্রভাব শুধু বাংলা নয়, পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রেই। এবার, ওই গূঢ় সমাজতত্ত্ব এড়িয়ে, পাঠক কী করে বাংলা ভাষার টানে এগিয়ে আসবে, তার কোনও ফর্মুলা আছে কি না, সে বিষয়ে আলোচনা চলতেই পারে। আমরা, যারা বাংলা ভাষায় লিখছি, তারা এতে বড়জোর নিজেদের 'শিক্ষিত' করতে পারি। কিন্তু মোদ্দা কথা, এমন কিছু লিখতে হবে যা পাঠককে আকৃষ্ট বা বাধ্য করবে পড়তে। অডিও-ভিসুয়ালের দাপট এবং তার অমোঘ সত্যতা মেনে নিয়েই সত্যি সত্যি ভাবাবে বা আনন্দ দিতে পারবে, এরকম কিছু যদি আমরা লিখতে পারি, তবে কেন পাঠক আসবে না? তাতে বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যশ্রীও বহাল থাকবে বলে আমি মনে করি।

আপনার সদ্যপ্রকাশিত 'তেজস্বিনী ও শবনম' উপন্যাসটি লেখার পরিপ্রেক্ষিত, প্ল্যানিং, রিসার্চ ওয়ার্ক সম্বন্ধে একজন পাঠক হয়ে জানার আগ্রহ হচ্ছে।

কুণাল বসু আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি প্রথমেই কোনও 'বিষয়' ভেবে লিখতে বসতে পারি না। মাঝখানে 'মানুষ পাচার' মানে হিউম্যান ট্র্যাফিকিং নিয়ে আমার একটা কৌতূহল জন্মেছিল। মূলত নারী পাচার। সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়াও শুরু করি। 'পাচার' হতে গিয়ে ফিরে আসা মানুষজনের সঙ্গে আলাপ, কথা বলা, ইন্টারভিউ নেওয়া। সে সূত্রেই একবার সন্দেশখালিতে গিয়ে পৌঁছই। খবর পাই, একটি ভাঙা স্কুলবাড়িতে ১২ জন বাচ্চা বাচ্চা মেয়েকে পাচার থেকে উদ্ধার করে এনে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই রেকর্ডার, পেন-খাতা নিয়ে পৌঁছে যাই। কিন্তু তাদের আতঙ্কিত চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই করতে পারিনি। কলকাতা থেকে বড়জোর ৫০-৬০ কিলোমিটারের মধ্যে এমন রূঢ় বাস্তব আমাকে বিপন্ন করে দিয়েছিল। এদের অনেকেই হয়তো দিল্লি বা গুরগাঁও পাচার হয়ে যেতে পারত। এমনকী, মধ্যপ্রাচ্যেও। ইরাক, ইরান, লেবানন। এরকম জায়গায় যুদ্ধের ক্যাম্পে এরাই তো নর্তকী হয়ে যায়, আর কী কী হয়— ভাবতে পারা যায় না! আর সেই সন্দেশখালি থেকেই উঠে আসে 'শবনম' চরিত্রটি।

এরপর আমি ভাবতে থাকি, কীভাবে ইরাকের ওয়ার ফ্রন্টের ঘটনা আনা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা টাটকা ঘটনা বা মূল জায়গার সম্মুখীন হওয়ার পরিস্থিতি সম্ভবই ছিল না। ইরাক যাব কী করে? ভিসাই পাওয়া অসম্ভব। সেখানে গিয়ে খবর সংগ্রহও সোজা কাজ নয়। এদিকে, মাথায় ওটাই ঘুরছে। তখন, অন্য একটা রাস্তা গ্রহণ করি। ইরাক যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারের লেখা একাধিক বই ও জার্নালের শরণাপন্ন হই। খুঁজে খুঁজে লন্ডনে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপও হয়। তাঁদের ইন্টারভিউ নিই। তাঁদের কথা শুনি। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায়, গত এক বছর সময়কালে, প্রায় ৪০০ সাংবাদিক মারা গিয়েছেন। কিছু সাংবাদিক ফিরে আসতে পেরেছেন। কিছু ফিরেছেন পাগল হয়ে। স্কিৎজোফ্রেনিক হয়ে গিয়েছেন কেউ কেউ বা। পাশ্চাত্যের সুস্থ ও সুলভ জীবনকে তাচ্ছিল্য করে কোন সাহসে, কোন সুইসাইডাল মনস্তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন ইরাকে এবং এতখানি সামনে থেকে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে আনলেন, সেই কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখান থেকেই উঠে আসে উপন্যাসের আরেকজন চরিত্র— 'তেজস্বিনী'। পেশায়, যে মেয়েটি যুদ্ধ-সাংবাদিক। ক্রমশ আমার উপন্যাস সেজে ওঠে।

শুনেছি, যখন লেখেন আপনি তখন একটাই উপন্যাস লেখেন। অন্য লেখাতে

হাত দেন না। তো, এই 'তেজস্বিনী ও শবনম' উপন্যাসটি কতদিন ধরে লিখেছিলেন? এত রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন আপনি কীভাবে আপনার উপন্যাসে তুলে আনেন?

কুণাল বসু এই উপন্যাসটি আমি গত বছর শেষ করি। প্রায় ছ'মাস সময় লেগেছিল। লেখার ক্ষেত্রে যেটা প্রথম বিষয়, তা হল— এমন একটা গল্প আমার মাথায় আসতে হবে, যেটা আমাকে ঘুমতে দেবে না। রাত জাগিয়ে রাখবে। নয়তো, তার সঙ্গে কিছু মাস বা বছর কাটাব কী করে! যেমন ধরুন, 'কলকাত্তা'। প্রায় দেড় বছর রিসার্চ করার পর লেখা উপন্যাস। আমার জন্ম-কর্ম কলকাতায়। তাই বলে তো এই নয়, কলকাতার উপর একটা উপন্যাস লিখতে চাইলেই লিখে ফেলা যায়। একটা গল্প তো মাথায় আসতে হবে! ফলে লেখার শুরুটাই হয় একটা গল্পের প্লট দিয়ে। কিন্তু কোত্থেকে আসবে সেই প্লট, তা আমার কাছে আজও সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন।

যেমন ধরুন, এই 'তেজস্বিনী ও শবনম' উপন্যাসের প্লট, সন্দেশখালি থেকেই আমার মাথায় ঘুরতে থাকে। তারপর, নিজেকে প্রশ্ন করি, যদি এই প্লটকে বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে আমাকেও তো সে বিষয়ে শিক্ষিত হতে হবে! অনেক ঔপন্যাসিকই নিজেদের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা তুলে এনে, স্মৃতি থেকে অভিজ্ঞতা তুলে এনে উপন্যাস লিখে থাকেন। সেক্ষেত্রে তেমন রিসার্চ ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আমি তেমন লেখার পরিপন্থী। আমি এমন কিছু লিখতে চাই, যা আমাকেও শিক্ষিত করবে। আমাকেও পড়তে হবে।

যদি আমার মনে হয়, এই গল্পটা বলতে চাই, তার পরমুহূর্তেই প্রশ্ন জাগে— কেন বলতে চাই। মার্কেস বলেছিলেন, পৃথিবীতে অনেক গল্পই 'তোমার' অর্থাৎ লেখকের মাথায় আসবে, যেগুলো মাথায় নড়াচড়া করলে মনে হবে— বেশ তো, বেশ ইন্টারেস্টিং প্লট তো। তাহলে কিন্তু সেটা লিখতে যেও না। সেই গল্পটাই লেখো, যেটা তোমার হৃদয় উদ্বেলিত করবে।

একটা প্রশ্ন এখানে অবধারিতভাবে আসছে। যদি আপনি যথাযথ গবেষণা বা তথ্য জোগাড় না করতে পারেন, তখন তো আপনাকে নিশ্চয়ই থেমে থাকতে হয়। সেই অস্থির মুহূর্তগুলোর সঙ্গে আপনি কীভাবে মোকাবিলা করেন?

কুণাল বসু এক্ষেত্রে আমি প্রচণ্ড একগুঁয়ে ও গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ। যদি আমার মনে হয়, এই গল্পটা বলতে চাই, তার পরমুহূর্তেই প্রশ্ন জাগে— কেন বলতে চাই। এ ব্যাপারে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একটা কথা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে। মার্কেস বলেছিলেন, পৃথিবীতে অনেক গল্পই 'তোমার' অর্থাৎ লেখকের মাথায় আসবে, যেগুলো মাথায় নড়াচড়া করলে মনে হবে— বেশ তো, বেশ ইন্টারেস্টিং প্লট তো। তাহলে কিন্তু সেটা লিখতে যেও না। সেই গল্পটাই লেখো, যেটা তোমার হৃদয় উদ্বেলিত করবে। আর, হৃদয় যদি উদ্বেলিতই করে, প্রয়োজনীয় গবেষণার সন্ধান আমি পাবই।

(পরবর্তী অংশ সোমবার)

'তেজস্বিনী ও শবনম'-এর প্রকাশক দে'জ

bhaskar.identity1980@gmail.com

Copyright © 2016 Pratidin Prakasani Pvt Ltd. All rights reserved | Made in GLOBOPEX (http://www.globopex.com)